দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 JUL 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সম্পাদকীয়

কোমলমতি শিক্ষার্থীর পিঠে বইয়ের বোঝা

রবীন্দ্রনাথের তোতাকাহিনী আরেকবার স্মরণ করা যাক। একটি তোতাপাখিকে শিক্ষিত করিতে বন্দী করা হয়। কিছুতেই উপায় না পাইয়া পণ্ডিতেরা তোতার পেট ঠাসিয়া ভরিয়া দেয় পুঁথির কাগজ। তাহাতে যাহা হইবার তাহাই হয়—পাখিটা যায় মরিয়া। এইভাবে উচিত শিক্ষা দেওয়া হয় পাখিটাকে। আমাদের কোমলমতি শিশুরা ভারবাহী প্রাণীর মতো বইয়ের বোঝা লইয়া বিদ্যালয়ে যায়। এই দৃশ্যের সহিত প্রতীকীভাবে কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় তোতাকাহিনীর তোতাপাখির। সম্প্রতি সংসদে একজন সংসদ সদস্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন স্কুলপড়ুয়া শিশুদের এই বইয়ের বোঝা লইয়া। সেই প্রশ্নের উত্তরে শিশুদের শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত তিনটির অধিক বই না লইয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন শিক্ষামন্ত্রী। ওই সংসদ সদস্য আরও জানাইয়াছেন, বিশেষজ্ঞ মতে—একজন শিশুর ব্যাগের ওজন নিজের ওজনের ১০ শতাংশের কম হইতে হইবে। অথচ শিশুদের ব্যাগের ওজন কাহারো চার কেজি, ছয় কেজি বা সাড়ে সাত কেজি অবধি দেখা যায়। কোনো শিশুর বোর্ড নির্ধারিত তিনটি বই থাকিলেও তাহাকে বহন করিতে হয় ১২টি বই। প্রকৃতপক্ষে, স্কুলব্যাগের ওজন স্বাভাবিক সীমার মাত্রা পার করিলে কল্পনাতীত ক্ষতি হইতে পারে। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে 'স্কুলিওসিস'। ইহার ফলে শিশুরা যখন বয়োবৃদ্ধ হইবে, তখন আরও ভয়ঙ্কর শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিষয়খানি অতীব গুরুত্বের সহিত ভাবিয়া দেখা দরকার। জানা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত তিনটির বাহিরে আরও ছয় হইতে দশখানি বই প্রায় সব বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য শ্রেণিতে এ সংখ্যা খানিকটা কম, দুইটি হইতে ছয়টি পর্যন্ত সহায়ক বই দেওয়ার প্রচলন রহিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন বটে, সরকার প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত তিনটি বই নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। এই সব বইয়ের বাহিরে শিশুরা যে অতিরিক্ত বই লইয়া স্কুলে যায়, সেসব গাইড বা সহায়ক বই পাঠ্যভুক্ত হওয়ার নিয়মই নাই। এই ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রী অভিভাবকদের ভূমিকা রাখিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবতা হইল, অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের চাপাইয়া দেওয়া আদেশের জালে বন্দী থাকেন। বলা যায়, তিনখানি বইয়ের বাহিরে যে অতিরিক্ত সহায়ক বই বিদ্যালয় কর্তৃক বুকলিস্টে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, তাহার সংস্থান না করিয়া উপায় থাকে না অভিভাবকের। কেননা, প্রাথমিক স্তর হইতেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিযোগিতামূলক। সুতরাং সকল অভিভাবকই চাহেন, সহায়কপুস্তক বা গাইড বই নয়খানি কেন, নব্বইটি হইলেও আপত্তি নাই—তাহার শিশুসন্তান যেন সহপাঠীদের তুলনায় পিছাইয়া না পড়ে। অথচ পত্রিকান্তরে প্রকাশিত বিভিন্ন স্কুলের অভিভাবকদের মতামত হইতে জানা যায়, তাহাদের অধিকাংশই এসব বাড়তি বইয়ের বিপক্ষে। তাহাদের মতে, দেশের প্রায় ৬৪ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণির প্রায় এক কোটি শিক্ষার্থী বিনামূল্যে সরকার হইতে দেওয়া বোর্ডের বইসমূহই শুধু পড়িতেছে। পাবলিক পরীক্ষাসমূহে তাহাদের ফল কোনো অংশেই খারাপ নহে। সেখানে বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহে এত বেশি বাড়তি বিষয় পড়ার চাপ কি তাহাদের প্রাথমিক ভিত মজবুত করিবার পক্ষে সহায়ক, নাকি বিপরীত ভূমিকা রাখে?

তাই, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বরং উল্টা প্রশ্ন করা যায়, সহায়ক বই নিষিদ্ধ হইবার পরও তাহা কি করিয়া কোটি কোটি কোমলমতি শিক্ষার্থীর পিঠে বোঝা হইয়া চাপিয়া বসে? কি করিয়া সেসব বই ছাপা হয়, বিতরণ হয়, বুকলিস্টেও ঢোকে? মূলত এইখানে রহিয়াছে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। সেই ব্যবসার বোঝা বহন করিতে হইতেছে কোমলমতি শিশুদের। সেই মাশুল দিতে হইতেছে সুদূরপ্রসারী শারীরিক ক্ষতির মাধ্যমে। বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এতদ্‌বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আর কতকাল বিলম্ব হইবে?